ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি

(১৯৬৫) – গল্প

ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি – ১ম পর্ব

রাজেনবাবুকে রোজ বিকেলে ম্যাল্-এ আসতে দেখি। মাথার চুল সব পাকা, গায়ের রং ফরসা, মুখের ভাব হাসিখুশি। পুরনো নেপালি আর তিব্বতি জিনিস-টিনিসের যে দোকানটা আছে সেটায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে বাইরে এসে বেঞ্চিতে আধঘণ্টার মতো বসে সন্ধে হব-হব হলে জলাপাহাড়ে বাড়ি ফিরে যান। আমি আবার একদিন ওঁর পেছন পেছন গিয়ে ওঁর বাড়িটাও দেখে এসেছি। গেটের কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি, হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কে হে তুমি, পেছু নিয়েছ?’ আমি বললাম, ‘আমার নাম তপেশরঞ্জন বোস।’ ‘তবে এই নাও লজেঞ্চুস’ বলে পকেট থেকে সত্যিই একটা লেমন-ড্রপ বার করে আমায় দিলেন, আর দিয়ে বললেন, ‘একদিন সকাল সকাল এসো আমার বাড়িতে— অনেক মুখোশ আছে; দেখাবো।’

সেই রাজেনবাবুর যে এমন বিপদ ঘটতে পারে, তা কেউ বিশ্বাস করবে?

ফেলুদাকে কথাটা বলতেই সে খ্যাক করে উঠল।

‘পাকামো করিসনে। কার কিভাবে বিপদ ঘটবে না-ঘটবে সেটা কি মানুষকে দেখলে বোঝা যায়?’

আমি দস্তুরমতো রেগে গেলাম।

‘বা রে, রাজেনবাবু যে ভাল লোক, সেটা বুঝি দেখলে বোঝা যায় না? তুমি তো তাকে দেখোইনি। দার্জিলিং-এ এসে অবধি তো তুমি বাড়ি থেকে বেরোওইনি। রাজেনবাবু নেপালি বস্তিতে গিয়ে গরিবদের কত সেবা করেছেন জান?’

‘আচ্ছা বেশ বেশ, এখন বিপদটা কী তাই শুনি। আর তুই কচি খোকা, সে বিপদের কথা তুই জানলি কী করে?’

কচি খোকা অবিশ্যি আমি মোটেই না, কারন আমার বয়স সাড়ে তের বছর। ফেলুদার বয়স আমার ঠিক ডাবল। সত্যি বলতে কি— ব্যাপারটা আমার জানার কথা নয়। ম্যাল-এ বেঞ্চিতে বসেছিলাম— আজ রবিবার, ব্যান্ড বাজাবে, তাই শুনব বলে। আমার পাশে বসেছিলেন তিনকড়িবাবু, যিনি রাজেনবাবুর ঘর ভাড়া নিয়ে দার্জিলিং-এ গরমের ছুটি কাটাতে এসেছেন। তিনকড়িবাবু ‘আনন্দবাজার’ পড়ছিলেন, আর আমি কোনওরকমে উঁকিঝুঁকি মেরে ফুটবলের খবরটা দেখার চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্যাকাসে মুখ করে রাজেনবাবু এসে ধপ করে তিনকড়িবাবুর পাশে বসে গায়ের চাদরটা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন।

তিনকড়িবাবু কাগজ বন্ধ করে বললেন, ‘কী হল, চড়াই উঠে এলেন নাকি?’

রাজেনবাবু গলা নামিয়ে বললেন, ‘আরে না মশাই। এক ইনক্রেডিবল ব্যাপার!’

ইনক্রেডিবল কথাটা আমার জানা ছিল। ফেলুদা ওটা প্রায়ই ব্যবহার করে। ওর মানে ‘অবিশ্বাস্য’।

তিনকড়িবাবু বললেন, ‘কী ব্যাপার?’

‘এই দেখুন না।’

রাজেনবাবু পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা নীল কাগজ বার করে তিনকড়িবাবুর হাতে দিলেন। বুঝতে পারলাম সেটা একটা চিঠি।

আমি অবিশ্যি চিঠিটা পড়িনি, বা পড়ার চেষ্টাও করিনি; বরঞ্চ আমি উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে গুনগুন করে গান গেয়ে এমন ভাব দেখাচ্ছিলাম যেন বুড়োদের ব্যাপারে আমার কোন ইন্টারেস্টই নেই। কিন্তু চিঠিটা না পড়লেও, তিনকড়িবাবুর কথা আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

‘সত্যিই ইনক্রেডিবল। আপনার উপর কার এমন আক্রোশ থাকতে পারে যে আপনাকে এভাবে শাঁসিয়ে চিঠি লিখবে?’

রাজেনবাবু বললেন, ‘তাই তো ভাবছি। সত্যি বলতে কি, কোনদিন কারও অনিষ্ট করেছি বলে তো মনে পড়ে না।’
তিনকড়িবাবু এবার রাজেনবাবুর দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন, ‘হাটের মাঝখানে এ সব ডিসকাস না করাই ভাল। বাড়ি চলুন।’
দুই বুড়ো উঠে পড়লেন।

ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি – ২য় পর্ব

ফেলুদা ঘটনাটা শুনে কিছুক্ষন ভুরু কুঁচকে গুম হয়ে বসে রইল। তারপর বলল, ‘তুই তাহলে বলছিস যে একবার তলিয়ে দেখা চলতে পারে?’

‘বা রে–তুমিই তো রহস্যজনক ঘটনা খুঁজছিলে। বললে, অনেক ডিটেকটিভ বই পড়ে তোমারও ডিটেকটিভ বুদ্ধিটা খুব ধারালো হয়ে উঠেছে।’

‘তা তো বটেই। এই ধর–আমি তো আজ ম্যালে যাইনি, তবু বলে দিতে পারি তুই কোন্ দিকের বেঞ্চে বসেছিলি।’

‘কোন দিক?’

‘রাধা রেস্টুরান্টের ডান পাশের বেঞ্চগুলোর একটাতে।’

‘আরেব্বাস! কী করে বুঝলে?’

‘আজ বিকেলে রোদ ছিল। তোর বাঁ গালটা রোদে ঝলসেছে, ডান ধারেরটা ঝলসায়নি। একমাত্র ওই বেঞ্চিগুলোর একটাতে বসলেই পশ্চিমের রোদটা বাঁ গালে পড়ে।’

‘ইনক্রেডিবল।’

‘যাক গে। এখন কথা হচ্ছে–রাজেন মজুমদারের বাড়িতে একবার যাওয়া দরকার।’

ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি – ৩য় পর্ব

'আর সাতাত্তর পা।'

'আর যদি না হয়?'

'হবেই ফেলুদা। আমি সেবার গুনেছিলাম।'

'না হলে গাঁট্টা তো?'

'হ্যাঁ— কিন্তু বেশি জোরে না । জোরে মারলে মাথার ঘিলু এদিক-ওদিক হয়ে যায়।'

কী আশ্চর্য— সাতাত্তরে রাজেনবাবুর বাড়ি পৌঁছলাম না। আরও তেইশ পা গিয়ে তবে ওর বাড়ির গেটের সামনে গিয়ে পড়লাম।

ফেলুদা ছোট্ট করে একটা গাঁট্টা মেরে বলল, 'আগের বার ফেরার সময় গুনেছিলি, না আসার সময়?'

'ফেরার সময়।'

'ইডিয়ট! ফেরার সময় তো ঢালে নামতে হয়। তুই নিশ্চয়ই ধাঁই ধাঁই করে ইয়া বড় বড় স্টেপস ফেলেছিলি!'

'তা হবে।'

'নিশ্চয়ই তাই। আর তাই স্টেপস সেবার কম হয়েছিল, এবার বেশি হয়েছে। জোয়ান বয়সে ঢালে নামতে মানুষ বড় বড় পা ফেলে দৌড়ানোর মতো। আর বুড়ো হলে ঢালুর বেলা ব্রেক ক'ষে ক'ষে ছোট ছোট পা ফেলতে হয়-তা না হলে মুখ থুবড়ে পড়ে।'

কাছাকাছি কোনও বাড়ি থেকে রেডিওতে গান শোনা যাচ্ছে। ফেলুদা এগিয়ে কলিংবেল টিপল।

'কী বলবে সেটা ঠিক করেছ ফেলুদা?'

'যা খুশি তাই বলব। তুই কিন্তু স্পিকটি-নট। যতক্ষণ থাকবি এ বাড়িতে একটি কথাও বলবিনে।'

'কিছু জিজ্ঞেস করলেও না!'

'শাটাপ!'

একটা নেপালি চাকর এসে দরজা খুলে দিল।

'অন্দর আইয়ে।'

বৈঠকখানায় ঢুকলাম। বেশ সুন্দর পুরনো প্যাটার্নের কাঠের বাড়ি। শুনেছি রাজেনবাবু দশ বছর হল রিটায়ার করে দার্জিলিং-এ আছেন।

কলকাতায় বেশ নামকরা উকিল ছিলেন।

চেয়ার টেবিল যা আছে ঘরে, সব বেতের। যেটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে, চারিদিকে দেওয়ালে টাঙানো সব অদ্ভুত দাত-খিঁচানো চোখ-রাঙানো মুখোশের সারি। আর আছে পুরনো ঢাল, তলোয়ার, ভোজালি, থালা, ফুলদানি এইসব। কাপড়ের উপর রং করা বুদ্ধের ছবিও আছে-কত পুরনো কে জানে? কিন্তু তাতে যে সোনালি রংটা আছে সেটা এখনো ঝলমল করছে।

আমরা দু'জনে দুটো বেতের চেয়ারে বসলাম।

ফেলুদা দেওয়ালের এদিক-ওদিক দেখে বলল, 'পেরেকগুলো সব নতুন, মরচে ধরেনি। ভদ্রলোকের প্রাচীন জিনিসের শখটা বোধহয় বেশি প্রাচীন নয়।'

রাজেনবাবু ঘরে ঢুকলেন।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম ফেলুদা উঠে গিয়ে ঢিপ করে এক পেন্নাম ঠুঁকে বলল, 'চিনতে পারছেন? আমি জয়কৃষ্ণ মিত্তিরের ছেলে ফেলু।'

রাজেনবাবু প্রথমে চোখ কপালে তুললেন, তারপর চোখের দু'পাশ কুঁচকিয়ে একগাল হেসে বললেন, 'বা-বা! কত বড় হয়েছ তুমি, অ্যাঁ?

কবে এলে এখানে? বাড়ির সব ভাল? বাবা এসেছেন?'

ফেলুদা জবাব দিচ্ছে, আর আমি মনে মনে বলছি— কী অন্যায়, এত কথা হল, আর ফেলুদা একবারও বলল না সে রাজেনবাবুকে চেনে?

এবার ফেলুদা আমার পরিচয়টাও দিয়ে দিল। রাজেনবাবুর মুখ দেখে মনেই হল না যে, এই সাত দিন আগে আমাকে লজেঞ্চুস দেবার কথাটা ওঁর মনে আছে।

ফেলুদা এবার বলল, 'আপনার খুব প্রাচীন জিনিসের শখ দেখছি।'

রাজেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। এখন তো প্রায় নেশায় দাঁড়িয়েছে।'

'কদ্দিনের ব্যাপার?'

'এই তো মাস ছয়েক হবে। কিন্তু এর মধ্যেই অনেক কিছু সংগ্রহ করে ফেলেছি।'

ফেলুদা এবার একটা গলা-খাঁকরানি দিয়ে, আমার কাছ থেকে শোনা ঘটনাটাই শুনিয়ে বলল, 'আপনি আমার বাবার মামলার ব্যাপারে যেভাবে সাহায্য করেছিলেন, তার প্রতিদানে আপনার এই বিপদে যদি কিছু করতে পারি...'

রাজেনবাবুর ভাব দেখে মনে হল তিনি সাহায্য পেলে খুশিই হবেন, কিন্তু তিনি কিছু বলবার আগেই তিনকড়িবাবু ঘরে ঢুকলেন। তাঁর হাঁপানোর বহর দেখে মনে হল বোধহয় বেড়িয়ে ফিরলেন। রাজেনবাবু আমাদের সঙ্গে ভদ্রলোকের আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার বিশেষ বন্ধু অ্যাডভোকেট জ্ঞানেশ সেন হচ্ছে তিনকড়িবাবুর প্রতিবেশী। আমি ঘর ভাড়া দেব শুনে জ্ঞানেশই ওকে সাজেস্ট করে আমার এখানে আসতে। গোড়ায় উনি হোটেলের কথা ভেবেছিলেন।'

তিনকড়িবাবু হেসে বললেন, 'আমার ভয় ছিল আমার এই চুরুটের বাতিকটা নিয়ে। এমনও হতে পারতো যে রাজেনবাবু হয়তো চুরুটের গন্ধ সহ্য করতে পারেন না। তাই সেটা আমি আমার প্রথম চিঠিতেই লিখে জানিয়ে দিয়েছিলাম।'

ফেলুদা বলল, 'আপনি কি বায়ু পরিবর্তনের জন্যে এসেছেন?'

'তা বটে। তবে বায়ুর অভাবটাই যেন লক্ষ্য করছি বেশি। পাহাড়ে ঠাণ্ডাটা আরেকটু বেশি এক্সপেক্ট করে লোকে।'

ফেলুদা হঠাৎ বলল, 'আপনার বোধহয় গান-বাজনার শখ?'

তিনকড়িবাবু অবাক হাসি হেসে বললেন, 'সেটা জানলে কী করে হে?'

'আপনি যখন কথা বলছেন তখন লক্ষ্য করছি যে, লাঠির ওপর রাখা আপনার ডান হাতের তর্জনীটা রেডিওর সঙ্গে তাল রেখে যাচ্ছে।'

রাজেনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'মোক্ষম ধরেছ। উনি ভালো শ্যামা সঙ্গীত গাইতে পারেন।'

ফেলুদা এবার বলল, 'চিঠিটা হাতের কাছে আছে?'

রাজেনবাবু বললেন, 'হাতের কাছে কেন, একেবারে বুকের কাছে।'

রাজেনবাবু কোটের বুক পকেট থেকে চিঠিটা বার করে ফেলুদাকে দিলেন। এইবার সেটা দেখার সুযোগ পেলাম।

হাতে-লেখা চিঠি নয়। নানান জায়গা থেকে ছাপা বাংলা কথা কেটে কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে চিঠিটা লেখা হয়েছে। যা লেখা হয়েছে, তা হল এই—'তোমার অন্যায়ের শাস্তি ভোগ করিতে প্রস্তুত হও।'

ফেলুদা বলল, 'এ চিঠি কি ডাকে এসেছে?'

রাজেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। লোক্যাল ডাক-বলা বাহুল্য। দুঃখের বিষয় খামটা ফেলে দিয়েছি। দার্জিলিং-এরই পোস্টমার্ক ছিল। ঠিকানাটাও ছাপা বাংলা কথা কেটে কেটে লেখা।'

'আপনার নিজের কাউকে সন্দেহ হয়?'

'কী আর বলব বলো! কোনওদিন কারও প্রতি কোনও অন্যায় বা অবিচার করেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'আপনার বাড়িতে যাতায়াত করেন এমন কয়েকজনের নাম বলতে পারেন?'

'খুব সহজ। আমি লোকজনের সঙ্গে মিশি কমই। ডাক্তার ফণী মিত্তির আসেন অসুখ-বিসুখ হলে...'

'কেমন লোক বলে মনে হয়?'

'ডাক্তার হিসেবে বোধহয় সাধারন স্তরের। তবে তাতে আমার এসে যায় না, কারণ আমার ব্যারামও সাধারন—সর্দি-জ্বর ছাড়া আর কিছুই হয়নি দার্জিলিং এসে অবধি। তাই ভালো ডাক্তারের প্রয়োজন হয় না!'

'চিকিৎসা করে পয়সা নেন?'

'তা নেন বইকি। আর আমারও তো পয়সার অভাব নেই। মিথ্যে অবলিগেশনে যাই কেন?'

'আর কে আসেন?'

'সম্প্রতি মিস্টার ঘোষাল বলে এক ভদ্রলোক যাতায়াত... এই দ্যাখো!'

দরজার দিকে ফিরে দেখি একটি ফরসা, মাঝারি হাইটের, স্যুট-পরা ভদ্রলোক হাসিমুখে ঘরে ঢুকছেন।

'আমার নাম শুনলাম বলে মনে হল যেন!'

রাজেনবাবু বললেন, 'এইমাত্র আপনার নাম করা হয়েছে। আপনারও যে আমার মতো পুরনো জিনিসের শখ-সেটাই এই ছেলেটিকে বলতে যাচ্ছিলুম। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—'

নমস্কার-টমস্কারের পর মিস্টার ঘোষাল-পুরো নাম অবনীমোহন ঘোষাল-রাজেনবাবুকে বললেন, 'আপনাকে আজ দোকানে দেখলুম না, তাই একবার ভাবলুম খোজ নিয়ে যাই।'

রাজেনবাবু বললেন, 'নাঃ,-আজ শরীরটা ভালো ছিল না।'

বুঝলাম রাজেনবাবু চিঠিটার কথা মিস্টার ঘোষালকে বলতে চান না। ফেলুদা মিস্টার ঘোষাল আসার সঙ্গে সঙ্গেই চিঠিটা হাতের তেলোর মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছে।

ঘোষাল বললেন, 'আপনি ব্যস্ত থাকলে আজ বরং...আসলে আপনার ওই তিব্বতি ঘন্টাটা একবার দেখার ইচ্ছে ছিল।'

রাজেনবাবু বললেন, 'সে তো খুব সহজ ব্যাপার। হাতের কাছেই আছে।'

রাজেনবাবু ঘন্টা আনতে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

ফেলুদা ঘোষালকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি এখানেই থাকেন?'

ভদ্রলোক দেওয়াল থেকে একটা ভোজালি নামিয়ে সেটা দেখতে দেখতে বললেন, 'আমি কোনও এক জায়গায় বেশিদিন থাকি না। আমার ব্যবসার জন্যে প্রচুর ঘুরতে হয়। আমি কিউরিও সংগ্রহ করি।'

বাড়ি ফেরার পথে ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম, 'কিউরিও' মানে দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন জিনিস।

রাজেনবাবু ঘন্টাটা নিয়ে আসলেন। দারুণ দেখতে জিনিসটা। নিচের অংশটা রুপোর তৈরি, হাতলটা তামা আর

পেতল মেশানো, আর তার ওপরে লাল নীল পাথর বসানো।
অবনীবাবু চোখ-টোখ কুঁচকে বেশ অনেকক্ষণ ধরে ঘন্টাটা এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন।
রাজেনবাবু বললেন, 'কী মনে হয়?'
'সত্যিই দাঁও মেরেছেন। একেবারে খাঁটি পুরনো জিনিস।'
'আপনি বললে আমার আর কোনও সন্দেহই থাকে না। দোকানদার বলে, এটা নাকি একেবারে খোদ লামার প্রাসাদের জিনিস।'
'কিছুই আশ্চর্য না। ...আপনি বোধহয় এটা হাতছাড়া করতে রাজি নন? মানে, ভালো দাম পেলেও?'
রাজেনবাবু মিষ্টি করে হেসে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, 'ব্যাপারটা কী জানেন? শখের জিনিস— ভালবেসে কিনেছি। সেটাকে বেচে লাভ করব, এমন কি কেনা দরেও বেচব— এই ইচ্ছে আমার নেই।'
অবনীবাবু ঘন্টাটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আজ আসি। কাল আশা করি বেরোতে পারবেন একবার।'
রাজেনবাবু বললেন, 'ইচ্ছে তো আছে।'
অবনীবাবু বেরিয়ে যাবার পর ফেলুদা রাজেনবাবুকে বলল, 'ক'টা দিন একটু না বেরিয়ে-টেরিয়ে সাবধানে থাকা উচিত নয় কি?'
'সেটাই বোধহয় ঠিক। কিন্তু মুশকিল কী জানো? সেই চিঠির ব্যাপারটা এতই অবিশ্বাস্য যে, এটাকে ঠিক যেন সিরিয়াসলি নিতেই পারছি না। মনে হচ্ছে এটা যেন একটা ঠাট্টা— যাকে বলে প্র্যাকটিক্যাল জোক।'
'যদ্দিন না সেটা সম্পর্কে ডেফিনিট হওয়া যাচ্ছে, তদ্দিন বাড়িতেই থাকুন না! আপনার নেপালি চাকরটা কদ্দিনের?'
'একেবারে গোড়া থেকেই আছে। কমপ্লিটলি রিলায়েবল।'
ফেলুদা এবার তিনকড়িবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'আপনি কি বেশিরভাগ সময় বাড়িতেই থাকেন?'
'সকাল-বিকেল ঘন্টাখানেক একটু এদিক-ওদিক ঘুরে আসি আর কি। কিন্তু বিপদ যদি ঘটেই, আমি বুড়ো মানুষ খুব বেশি কিছু করতে পারি কি? আমার বয়স হল চৌষট্টি। রাজেনবাবুর চেয়ে এক বছর কম।'
রাজেনবাবু বললেন, 'উনি চেঞ্জে এসেছেন, ওকে আর বাড়িতে বন্দি করে রাখার ফন্দি করছো কেন তোমরা? আমি থাকব, আমার চাকর
থাকবে, এই যথেষ্ট। তোমরা চাও তো দু'বেলা খোঁজ-খবর নিয়ে যেও এখন।'
'বেশ তাই হবে।'
ফেলুদার দেখাদেখি আমিও উঠে পড়লাম।
আমরা যেখানে বসেছিলাম তার উলটো দিকেই একটা ফায়ারপ্লেস। ফায়ারপ্লেসের উপরেই একটা তাক, আর সেই তাকের উপর তিনটি ফ্রেমে-বাঁধানো ছবি। ফেলুদা ছবিগুলোর দিকে এগিয়ে গেল।
প্রথম ছবিটা দেখিয়ে রাজেনবাবু বললেন, 'ইনি আমার স্ত্রী। বিয়ের চার বছর পরেই মারা গিয়েছিলেন।'
দ্বিতীয় ছবি, একজন আমার বয়সী ছেলের, গায়ে ভেলভেটের কোট।
ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'এটি কে?'
রাজেনবাবু হো হো করে হেসে বললেন, 'সময়ের প্রভাবে মানুষের চেহারার কী বিচিত্র পরিবর্তন ঘটতে পারে, সেইটে বোঝানোর জন্যে এই ছবি। উনি হচ্ছেন আমারই বাল্য সংস্করণ। বাঁকুড়া মিশনারি স্কুলে পড়তাম তখন। আমার বাবা ছিলেন বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট।'
সত্যি, ভারি ফুটফুটে চেহারা ছিল রাজেনবাবুর ছেলেবয়সে।

'অবিশ্যি ছবি দেখে ভুলো না। দুরন্ত বলে ভারি বদনাম ছিল আমার। শুধু যে মাস্টারদের জ্বালিয়েছি তা নয়, ছাত্রদেরও। একবার স্পোর্টসের দিন হান্ড্রেড ইয়ার্ডস-এ আমাদের বেস্ট রানারকে কাত করে দিয়েছিলাম, ল্যাং মেরে।'

তৃতীয় ছবিটা ফেলুদার বয়সী একজন ছেলের। রাজেনবাবু বললেন, সেটা তাঁর একমাত্র ছেলে প্রবীরের।

'উনি এখন কোথায়?'

রাজেনবাবু গলা খাঁকরিয়ে বললেন, 'জানি না ঠিক। বহুকাল দেশ ছাড়া, প্রায় সিক্সটিন ইয়ার্স।'

'আপনার সঙ্গে চিঠি লেখালেখি নেই?'

'নাঃ।'

ফেলুদা দরজার দিকে এগুতে এগুতে বলল, 'ভারি ইন্টারেস্টিং কেস।'

আমি মনে মনে বললাম, ফেলুদা একেবারে বইয়ের ডিটেকটিভের মতো কথা বলছে।

বাইরেটা ছম্ছমে অন্ধকার হয়ে এসেছে। জলাপাহাড়ের গায়ের বাড়িগুলোতে বাতি জ্বলে উঠেছে। পাহাড়ের নিচের দিকে চেয়ে দেখলাম, রঙ্গিত উপত্যকা থেকে কুয়াশা উপর দিকে উঠছে।

রাজেনবাবু আর তিনকড়িবাবু আমাদের সঙ্গে গেট অবধি এলেন। রাজেনবাবু গলা নামিয়ে ফেলুদাকে বললেন, 'তুমি ছেলেমানুষ, তাও তোমাকে বলছি–একটু যে নার্ভাস বোধ করছি না তা নয়। এমন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এ চিঠি যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত।'

ফেলুদা বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, 'আপনি কিছু ভাববেন না। আমি এর সমাধান করবই। আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন গিয়ে।'

রাজেনবাবু 'গুডনাইট এন্ড থ্যাংক ইউ' বলে চলে গেলেন।

এবার তিনকড়িবাবু ফেলুদাকে বললেন, 'তোমার–তোমাকে "তুমি" করেই বলছি–তোমার অবজারভেশনের ক্ষমতা দেখে আমি সত্যিই ইম্প্রেসড হইচি। ডিটেক্টিভ গল্প আমিও অনেক পড়েচি। এই চিঠিটার ব্যাপারে আমি হয়তো তোমাকে কিছুটা সাহায্যও করতে পারি।'

'তাই নাকি?'

'এই যে টুকরো টুকরো ছাপা কথা কেটে চিঠিটা লেখা হয়েছে, এর থেকে কী বুঝলে বলো তো?'

ফেলুদা কয়েক সেকেন্ড ভেবে বলল, 'এক নম্বর— কথাগুলো কাটা হয়েছে খুব সম্ভব ব্লেড দিয়ে— কাঁচি দিয়ে নয়।'

'ভেরি গুড।'

'দুই নম্বর— কথাগুলো নানারকম বই থেকে নেয়া হয়েছে— কারণ হরফ ও কাগজে তফাত রয়েছে।'

'ভেরি গুড। সেইসব বই সম্বন্ধে কোনও আইডিয়া করেছ?'

'চিঠির দু'টো শব্দ "শান্তি" আর "প্রস্তুত"— মনে হচ্ছে খবরের কাগজ থেকে কাটা।'

'আনন্দবাজার।'

'তাই বুঝি?'

'ইয়েস। ওই টাইপটা আনন্দবাজারেই ব্যবহার হয়— অন্য বাংলা কাগজে নয়। আর অন্য কথাগুলোও কোনওটাই পুরনো বই থেকে নেয়া হয়নি, কারণ যে হরফে ওগুলো ছাপা, সেটা হয়েছে, মাত্র পনের-বিশ বছর। ...আর যে আঠা দিয়ে আটকানো হয়েছে সেটা সম্বন্ধে কোন
ধারনা করেছ?'

‘গন্ধটা গ্রিপেক্স আঠার মতো।’

‘চমৎকার ধরেছ।’

‘কিন্তু আপনিও তো ধরার ব্যাপারে কম যান না দেখছি।’

তিনকড়িবাবু হেসে বললেন, ‘কিন্তু তোমার বয়সে আমি ডিটেকটিভ কথাটার মানে জানতুম কিনা সন্দেহ!’

বাড়ি ফেরার পথে ফেলুদা বলল, ‘রাজেনবাবুর মিস্ট্রি সল্‌ভ করতে পারব কিনা জানি না— কিন্তু সেই সূত্রে তিনকড়িবাবুর সঙ্গে আলাপটা বেশ ফাউ পাওয়া গেল।’

আমি বললাম, তা হলে উনিই ব্যাপারটা তদন্ত করুন না। তুমি আর মিথ্যে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?’

‘আহা— বাঙলা হরফের ব্যাপারটা জানা আছে বলে কি সবই জানবেন নাকি?’

ফেলুদার কথাটা শুনে ভালোই লাগল। ওর মতো বুদ্ধি আশা করি তিনকড়িবাবুর নেই। মাঝে মাঝে ফোড়ন দিলে আপত্তি নেই, কিন্তু আসল কাজটা যেন ফেলুদাই করে।

‘কাকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে ফেলুদা?’

‘অপরা—’

কথাটার মাঝখানেই ফেলুদা থেমে গেল। তার দৃষ্টি দেখলাম একজন লোককে ফলো করে পিছন দিকে ঘুরছে।

‘লোকটাকে দেখলি?’

‘কই, না তো। মুখ দেখিনি তো।’

‘ল্যাম্পের আলোটা পড়ল, আর ঠিক মনে হল’— ফেলুদা আবার থেমে গেল।

‘কী মনে হল ফেলুদা?’

‘নাঃ, বোধহয় চোখের ভুল। চ’ পা চালিয়ে চ’, খিদে পেয়েছে।’

ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি – ৪র্থ পর্ব

ফেলুদা হল আমার মাসতুতো দাদা। ও আর আমি আমার বাবার সঙ্গে দার্জিলিং-এ বেড়াতে এসে শহরের নীচের দিকে স্যানাটোরিয়ামে উঠেছি। স্যানোটোরিয়াম ভর্তি বাঙালি; বাবা তাদেরই মধ্য থেকে সমবয়সী বন্ধু জুটিয়ে নিয়ে তাসটাস খেলে গল্পটল্প করে সময় কাটাচ্ছেন। আমি আর ফেল্যদা কোথায় যাই, কী করি, তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না।

আজ সকালে আমার ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরী হয়েছে। উঠে দেখি বাবা রয়েছেন, কিন্তু ফেলুদার বিছানা খালি। কী ব্যাপার?

বাবাকে জিজ্ঞেস করতে বললেন, 'ও এসে অবধি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেনি। আজ দিনটা পরিষ্কার দেখে বোধহয় আগেভাগে বেড়িয়েছে।'

আমি কিন্তু মনে মনে আন্দাজ করেছিলুম যে ফেলুদা তদন্তের কাজ শুরু করে দিয়েছে, আর সেই কাজেই বেরিয়েছে। কথাটা ভেবে ভারী রাগ হল। আমাকে বাদ দিয়ে কিছু করার কথা তো ফেলুদার নয়।

যাই হোক্, আমিও মুখটুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

লেডেন লা রোডে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডটার কাছাকাছি এসে ফেলুদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি বললাম, 'বা-রে, তুমি আমায় ফেলে বেরিয়েছ কেন?'

'শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল–তাই ডাক্তার দেখাতে গেস্‌লাম।'

'ফণী ডাক্তার?'

'তোরও একটু একটু বুদ্ধি খুলেছে দেখছি।'

'দেখলে?'

'চার টাকা ভিজিট নিল, আর একটা ওষুধ লিখে দিল।'

'ভাল ডাক্তার?'

অসুখ নেই তাও পরীক্ষা করে ওষুধ দিচ্ছে–কেমন ডাক্তার বুঝে দ্যাখ; তার পর বাড়ির যা চেহারা দেখলাম, তাতে পসার যে খুব বেশি তাও মনে হয় না।'

'তা হলে উনি কখনওই চিঠিটা লেখেননি।'

'কেন?'

'গরিব লোকের অত সাহস হয়?'

'তা টাকার দরকার হলে হয় বইকী।'

'কিন্তু চিঠিতে তো টাকা চায়নি।'

'ওই ভাবে খোলাখুলি বুঝি কেউ টাকা চায়?'

'তবে?'

'রাজেনবাবুর অবস্থা কাল কী রকম দেখলি বল তো?'

'কেমন যেন ভিতু ভিতু।'

'ভয় পেয়ে মনের অসুখ হতে পারে, জানিস?'

'তা তো পারেই।'

‘আর মনের অসুখ থেকে শরীরের অসুখ?’

‘তাও হয় বুঝি?’

‘ইয়েস। আর শরীরের অসুখ হলে ডাক্তার ডাকতে হবে, সেটা আশা করি তোর মতো ক্যাবলারও জানা আছে।’

ফেলুদার বুদ্ধি দেখে আমার প্রায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। অবিশ্যি ফণী ডাক্তার যদি সত্যই এত সব ভেবে-টেবে চিঠিটা লিখে থাকে, তা হলে ওরও বুদ্ধি সাংঘাতিক বলতে হবে।

ম্যালের মুখে ফোয়ারার কাছাকাছি যখন এসেছি তখন ফেলুদা বলল, ‘কিউরিও সম্বন্ধে একটা কিউরিয়সিটি বোধ করছি।’

‘কিউরিও’র মানে আগেই শিখেছিলাম, আর কিউরিয়সিটি মানে যে কৌতূহল, সেটা ইস্কুলেই শিখেছি।

আমাদের ঠিক পাশেই ‘নেপাল কিউরিও সপ’। রাজেনবাবু আর অবনীবাবু এখানেই আসেন।

ফেলুদা সটান দোকানের ভেতর গিয়ে ঢুকল।

দোকানদারের গায়ে ছাই রঙের কোট, গলায় মাফলার আর মাথায় সোনালি কাজ করা কালো টুপি। ফেলুদাকে দেখে হাসি হাসি মুখে করে গিয়ে এল। দোকানের ভেতরটা পুরনো জিনিসপত্রে গিজগিজ করছে, আলোও বেশি নেই, আর গন্ধটাও যেন সেকেলে।

ফেলুদা এদিও-ওদিক দেখে গম্ভীর গলায় বলল, ‘ভাল পুরনো থাঙ্কা আছে?’

‘এই পাশের ঘরে আসুন। ভাল জিনিস বিক্রি হয়ে গেছে সব। তবে নতুন মাল আবার কিছু আসছে।’

পাশের ঘরের যাবার সময় আমি ফেলুদার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম, থাঙ্কা কী জিনিস?’

ফেলুদা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, ‘দেখতেই তো পাবি।’

পাশের ঘরটা আরও ছোট–যাকে বলে একেবারে ঘুপ্‌চি।

দোকানদার দেওয়ালে ঝোলানো সিল্কের উপর আঁকা একটা বুদ্ধের ছবি দেখিয়ে বলল, ‘এই একটাই ভালো জিনিস আছে–তবে একটু ড্যামেজড্‌।’

একেই বলে থাঙ্কা? এ জিনিস তো রাজেনবাবুর বাড়িতে অনেক আছে।

ফেলুদা ভীষণ বিজ্ঞের মত থাঙ্কাটার গায়ের উপর চোখ ঠেকিয়ে উপর থেকে নীচে অবধি প্রায় তিনি মিনিট ধরে দেখে বলল, ‘এটার বয়স তো সত্তর বছরের বেশি বলে মনে হচ্ছে না। আমি অন্তত তিনশো বছরের পুরনো জিনিস চাইছি।’

দোকানদার বলল, ‘আমরা আজ বিকেলে কিন্তু এক লট মাল পাচ্ছি। তার মধ্যে ভাল থ্যাঙ্কা পাবেন।’

‘আজই পাচ্ছেন?’

‘আজই।’

‘এ খবরটা তাহলে রাজেনবাবুকে জানাতে হয়।’

‘মিস্টার মজুমদার? ওনার তো জানা আছে। রেগুলার খদ্দের যে দু-তিন জন আছেন, তাঁরা সকলেই নতুন মাল দেখতে বিকেলে আসছেন।’

‘অবনীবাবুও খবরটা পেয়ে গেছেন? মিস্টার ঘোষাল?’

‘জরুর!’

‘আর বড় খদ্দের কে আছে আপনাদের?’

‘আর আছেন মিস্টার গিলমোর–চা বাগানের ম্যানেজার। সপ্তাহে দু দিন বাগান থেকে আসেন। আর মিস্টার

নাওলাখা। উনি এখন সিকিমে।'

'বাঙালি আর কেউ নেই?'

'না স্যার।'

'আচ্ছা দেখি, বিকেলে যদি একবার ঢুঁ মারতে পারি।'

তার পর আমার দিকে ফিরে বলল, 'তোপ্‌সে, তুই একটা মুখোশ চাস?'

তোপ্‌সে যদিও আমার আসল ডাকনাম নয়, তবু ফেলুদা তপেশ থেকে ওই নামটাই করে নিয়েছে।

মুখোশের লোভ কি সামলানো যায়? ফেলুদা নিজেই একটা বাছাই করে আমাকে কিনে দিয়ে বলল, ' এইটেই সবচেয়ে হরেনডোস্‌-কী বলিস?'

ফেলুদা বলে 'হরেনডাস্‌' বলে আসলে কোনও কথা নেই। 'ট্রিমেনডাস্‌' মানে সাংঘাতিক, আর 'হরিবল্‌' মানে বীভৎস। এই দুটো একসঙ্গে বোঝাতে নাকি কেউ কেউ 'হরেনডাস্‌' ব্যবহার করে। মুখোশটা সম্বন্ধে যে ওই কথাটা দারুন খাটে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

দোকান থেকে বেরিয়ে ফেলুদা আমার হাত ধরে কী একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। এবারও দেখি ফেলুদা একজন লোকের দিকে দেখছে। বোধ হয় কাল রাতে যাকে দেখেছিল, সেই লোকটাই। বয়স আমার বাবার মতো, মানে চল্লিশ-বেয়াল্লিশ, গায়ের রঙ ফরসা, চোখে কালো চশমা। যে স্যুটটা পরে আছে সেটা দেখে মনে হয় খুব দামি। ভদ্রলোক ম্যালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পাইপ ধরাচ্ছেন। আমার দেখেই কেমন যেন চেনা চেনা মনে হল, কিন্তু কোথায় দেখেছি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ফেলুদা সোজা লোকটার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে ভীষণ সাহেবি কায়দার উচ্চারণে বলল,

'এক্সকিউজ মি, আপনি মিস্‌ঠা ছ্যাঠাঝি?'

ভদ্রলোকও একটু গম্ভীর গলায় পাইপ কাপড়ে বলল, 'নো, আমি অ্যাম নঠ্‌।'

ফেলুদা খুবই অবাক হবার ভান করে বলল, 'স্ট্রেঞ্জ-আপনি সেণ্ট্রাল হোটেলে উঠেছেন না?'

ভদ্রলোক একটু হেসে অবজ্ঞার সুরে বলল, 'না। মাউণ্ট এভারেস্ট্‌। অ্যাণ্ড আই ডোণ্ট হ্যাভ এ টুইন ব্রাদার।'

এই বলে ভদ্রলোক গটগটিয়ে অবজারভেটলি হিলের দিকে চলে গেলেন। যাবার সময় লক্ষ করলাম যে তার কাছে একটা ব্রাউন কাগজে মোড়া প্যাকেট, আর কাগজটার গায়ে লেখা 'নেপালি কিউরিও শপ।'

আমি চাপা গলায় বললাম, 'ফেলুদা, উনিও কি মুখোশ কিনেছেন নাকি?'

'তা কিনতে পারে। মুখোশটা তো আর তোর-আমার একচেটিয়া নয়। ...চ', কেভেনটার্সে গিয়ে একটু কফি খাওয়া যাক।'

কেভেনটার্সের দিকে যেতে যেতে ফেলুদা বলল, 'লোকটাকে চিনলি?'

আমি বললাম, 'তুমিই চিনলে না, আমি আর কী করে চিনি বলো। তবে চেনা চেনা লাগছিল।'

'আমি চিনলাম না?'

'বা রে। কোথায় চিনলে? ভুল নাম বললে যে?'

'তোর যদি এতটুকু সেন্স থাকে। ভুল নাম বলেছি হোটেলের নামটা বের করার জন্য। সেটাও বুঝলি না? লোকটার আসল নাম কী জানিস?'

'কী?'

'প্রবীর মজুমদার।'

'ও হো! হ্যাঁ ঠিক, বলেছ! রাজেনবাবুর ছেলে, তাই না? যার ছবি রয়েছে তাকের উপর? অবিশ্যি বয়সটা এমন অনেক বেড়ে গেছে তো।'

শুধু যে চেহারায় মিল তা নয়–গালের আঁচিলটা নিশ্চয় তুইও লক্ষ করেছিল–আসল কথাটা হচ্ছে, ভদ্রলোকের জামা-কাপড় সব বিলিতি। স্যুট লণ্ডনের, টাই প্যারিসের, জুতো ইটালিয়ান, এমন কী রুমালটা পর্যন্ত বিলিতি। সত্য বিলেত-ফেরত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু ওঁর ছেলে এখানে রয়েছে সে খবর রাজেনবাবু জানেন না?'

'বাপ যে এখানে রয়েছে, সেটা ছেলে জানে কি না সেটাও খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার।'

রহস্য ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে, এই কথাটা ভাবতে ভাবতে কেভেন্টারের দোকানে পৌঁছলাম। দোকানের ছাতে যে বসার জায়গাটা আছে, সেটা আমার ভীষণ ভাল লাগে। চারদিকে দার্জিলিং শহরটা, আর ওই নীচে বাজারটা দারুন ভাল দেখায়।

ছাতে উঠে দেখি, কোণের টেবিলটায় চুরুট হাতে তিনকড়িবাবু বসে কফি খাচ্ছেন। ফেলুদাকে দেখতে পেয়েই হাত তুলে তাঁর টেবিলে গিয়ে বসতে বললেন আমাদের।

আমরা তিনকড়িবাবুর দু দিকে দুটো টিনের চেয়ারে বসলাম।

তিনকড়িবাবু ফেলুদাকে বললেন, 'ডিটেক্‌শনে তোমার পারদর্শিতা দেখে খুশি হয়ে আমি তোমাদের দুজনকে দুটো হট্‌ চকোলেট খাওয়াব–আপত্তি আছে?'

হট্‌ চকোলেটের নাম শুনে আমার জিভে জল এসে গেল।

তিনকড়িবাবু তুড়ি মেরে একটা বেয়ারাকে ডাকলেন।

বেয়ারা এসে অর্ডার নিয়ে গেলে পর তিনকড়িবাবু কোটের পকেট থেকে একটা বই বার করে ফেলুদাকে দিয়ে বললেন, 'এই নাও। একটা এক্সট্রা কপি ছিল–আমার লেটেস্ট্‌ বই। তোমায় দিলুম।'

বইয়ের মলাটটা দেখে ফেলুদার মুখটা হাঁ হয়ে গেল।

'আপনার বই মানে? আপনার লেখা? আপনিই 'গুপ্তচর' নাম নিয়ে লেখেন?'

তিনকড়িবাবু আধ-বোজা চোখে অল্প হাসি হেসে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বললেন।

ফেলুদার অবাক ভাব আরও যেন বেড়ে গেল।

'সে কী! আপনার সব ক'টা উপন্যাস যে আমার পড়া! বাংলায় আপনার ছাড়া আর কারুর রহস্য উপন্যাস আমার ভাল লাগে না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ! ব্যাপারটা কী জানে? এখানে একটা প্লট মাথায় নিয়ে লেখার জন্যই এসেছিলাম। এখন দেখছি, বাস্তব জীবনের রহস্য নিয়েই মাথা ঘামিয়ে ছুটিটা ফুরিয়ে গেল।'

'আমার সত্যিই দারুন লাক্‌–আপনাদের সঙ্গে এভাবে আলাপ হয়ে গেল।'

'দুঃখের বিষয় আমার ছুটির মেয়াদ সত্যিই ফুরিয়ে এসেছে। কাল সকালে চলে যাচ্ছি আমি। আশা করছি, যাবার আগে তোমাদের আরও কিছুটা হেলপ্‌ করে দিয়ে যেতে পারব।'

ফেলুদা এবার তার এক্‌সাইটিং খবরটা তিনকড়িবাবুকে দিয়ে দিল।

'রাজেনবাবুর ছেলেকে আজ দেখলাম।'

'বল কী হে?'

'এই দশ মিনিট আছে।'

‘তুমি ঠিক বলছ? চিনতে পেরেছ তো ঠিক?’

‘চোদ্দ আনা শিওর। মাউন্ট এভারেস্ট হোটেলে গিয়ে খোঁজ করলে বাকি দু আনাও পুরে যাবে বোধ হয়।’

তিনকড়িবাবু হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

‘রাজেনবাবুর মুখে তার ছেলের কথা শুনেছ?’

‘কাল যা বললেন, তার বেশি শুনিনি।’

‘আমি শুনেছি অনেক কথা। ছেলেটি অল্পবয়সে বখে গিয়েছিল। বাপের সিন্দুক থেকে টাকা চুরি করে ধরা পড়েছিল। রাজেনবাবু তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। ছেলেটি গিয়েওছিল তাই। ২৪ বছর বয়স তখন তার। একেবারে নিখোঁজ। রাজেনবাবু অনেক অনুসন্ধান করেছিলেন, কারণ পরে তাঁর অনুতাপ হয়। কিন্তু ছেলে কোনও খোঁজখবর নেয়নি বা দেয়নি। বিলেতে তাকে দেখেছিলেন রাজেনবাবুরই এক বন্ধু। তাও সে দশ-বারো বছর আগে।’

‘রাজেনবাবু তাহলে জানেন না যে তাঁর ছেলে এখানে আছে?’

‘নিশ্চয়ই না। আমার মনে হয় ওঁকে না জানানোই ভালো। একে এই চিঠির শক্, তার উপর...’

তিনকড়িবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন। তার পর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, ‘আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। রহস্য উপন্যাস লেখা ছেড়ে দেওয়া উচিত।’

ফেলুদা হাসতে হাসতে বলল, ‘প্রবীর মজুমদার যে চিঠি লিখে থাকতে পারেন, সেটা আপনার খেয়াল হয়নি তো?’

‘এগজ্যাক্টলি। কিন্তু...’

তিনকড়িবাবু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

বেয়ারা হট্ চকোলেট এনে টেবিলে রাখতে তিনকড়িবাবু যেন একটু চাগিয়ে উঠলেন। ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, ‘ফণী মিত্তিরকে কেমন দেখলে?’

ফেলুদা যেন একটু হকচকিয়ে গেল।

‘সে কি, আপনি কী করে জানলেন আমি ওখানে গেস্‌লাম?’

‘তুমি যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই আমিও গেস্‌লাম।’

‘আমাকে রাস্তায় দেখেছিলেন বুঝি?’

‘না।’

‘তবে?’

‘ডাক্তারের ঘরের মেঝেতে একটা মরা সিগারেট দেখে জিজ্ঞেস করলাম, কে খেয়েছে। ডাক্তার ধূমপান করেন না। ফণীবাবু তখন বর্ণনা দিলেন। তাতে তোমার কথা মনে হল, যদিও তোমাকে আমি সিগারেট খেতে দেখিনি। কিন্তু এখন তোমার আঙুলের গায়ে হলদে রঙ দেখে বুঝেছি, তুমি খাও।’

ফেলুদা তিনকড়িবাবুর বুদ্ধির তারিফ করে বলল, ‘আপনারও কি ফণী মিত্তিরকে সন্দেহ হয়েছিল না কি?’

‘তা হবে না? লোকটাকে দেখলে অভক্তি হয় কি না?’

‘তা হয়। রাজেনবাবু যে কেন ওকে আমল দেন জানি না।’

‘তাও জানো না বুঝি? দার্জিলিং-এ আসার কিছু দিনের মধ্যে রাজেনবাবুর ধম্মকম্মের দিকে মন যায়। তখন ফণীবাবুই তাকে এক গুরুর সন্ধান দিয়েছিলেন। একই গুরুর শিষ্য হিসাবে ওদের যে প্রায় ভাই-ভাই সম্পর্ক হে!’

ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, ‘ফণী মিত্তিরের সঙ্গে কথা বলে কী বুঝলেন?’

'কথা তো ছুতো। আসলে বইয়ের আলমারিগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলুম।'

'বাংলা উপন্যাস আছে কিনা দেখার জন্য?'

'ঠিক বলেছ।'

'আমিও দেখেছি, প্রায় নেই বললেই চলে। আর যা আছে, তাও আদ্যিকালের।'

'ঠিক।'

তবে ফণী ডাক্তার অন্যের বাড়ির বই থেকেও কথা কেটে চিঠি তৈরি করতে পারে।'

'তা পারে। তবে লোকটাকে দেখে ভারী কুঁড়ে বলে মনে হয়। এ ব্যাপারে অতটা কাঠখড় পোহাবে, সেটা কেন যেন বিশ্বাস হয় না।'

ফেলুদা এবার বলল, 'অবনী ঘোষাল লোকটা সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?'

'বিশেষ সুবিধের লোক নয় বলেই আমার বিশ্বাস। ভারী ওপর-চালাক। আর ও সব প্রাচীন শিল্প-টিল্প কিছু না। ওর আসল লোভ হচ্ছে টাকার। এখন খরচ করে জিনিস কিনছে, পরে বিদেশিদের কাছে বিক্রি করে পাঁচগুণ প্রফিট করবে।'

'ওর পক্ষে এই হুম্‌কি-চিঠি দেওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয় কি?'

'সেটা এখনও তলিয়ে দেখিনি।'

'আমি একটা কারণ আবিষ্কার করেছি।'

আমি অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে চাইলাম। ওর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

তিনকড়িবাবু বললেন, 'কী কারণ?'

ফেলুদা গলাটা নামিয়ে নিয়ে বলল, 'যে দোকান থেকে ওঁরা জিনিস কেনেন, সেখানে কিছু ভাল নতুন মাল আজ বিকেলে আসছে।'

এবার তিনকড়িবাবুর চোখও জ্বলজ্বল করে উঠল।

'বুঝেছি। হুম্‌কি চিঠি পেয়ে রাজেন মজুমদার ঘরে বন্দি হয়ে রইলেন, আর সেই ফাঁকতালে অবনী ঘোষাল দোকানে গিয়ে সব লুটেপুটে নিলেন।'

'এগজ্যাক্টলি!'

তিনকড়িবাবু চকোলেটের পয়সা দিয়ে উঠে পড়লেন। আমরা দুজনেও উঠলাম।

উৎসাহে আর উত্তেজনায় আমার বুকটা টিপ্ টিপ্ করছিল।

অবনী ঘোষাল, প্রবীর মজুমদার আর ফণী মিত্তির–তিনজনকেই তাহলে সন্দেহ করার কারণ আছে!

পনেরো মিনিটের মধ্যেই মাউণ্ট এভারেস্ট হোটেলে গিয়ে ফেলুদা সেই খবরটা জেনে নিল। প্রবীর মজুমদার বলে একজন ভদ্রলোক এই হোটেলের ষোল নম্বর ঘরে পাঁচ দিন হলে এসে রয়েছেন।

ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি – ৫ম পর্ব

বিকেলের দিকে রাজেনবাবুর বাড়িতে যাবার কথা ফেলুদা বলছিল, দুপুর থেকে মেঘলা করে চারটে নাগাত তেড়ে বৃষ্টি নামল। আকাশের চেহারা দেখে মনে হল বৃষ্টি সহজে থামবে না।

ফেলুদা সারাটা সন্ধে খাতা-পেনসিল নিয়ে কী সব যেন হিসেব করল। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছিল কী লিখছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না। শেষটায় আমি তিনকড়িবাবুর বইটা নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলাম। দারুণ থ্রিলিং গল্প। পড়তে পড়তে রাজেনবাবুর চিঠির ব্যাপারটা মন থেকে প্রায় মুছেই গেল।

আটটা নাগাত বৃষ্টি থামল। কিন্তু তখন এত শীত যে, বাবা আমাদের বেরোতে দিলেন না। পরদিন ভোরবেলা ফেলুদার ধাক্কার চোটে ঘুম ভাঙল। 'ওঠ্, ওঠ্–এই তোপ্‌সে–ওঠ!'

আমি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লাম। ফেলুদা কানের কাছে মুখ এনে দাঁতে দাঁত চেপে এক নিশ্বাসে বলে গেল, 'রাজেনবাবুর নেপালি চাকরটা এসেছিল। বলল, বাবু এখুনি যেতে বলেছেন–বিশেষ দরকার। তুই যদি যেতে চাস তো–'

'সে আর বলতে!'

পনেরো মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে রাজেনবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দেখি, তিনি ফ্যাকাশে মুখ করে খাটে শুয়ে আছেন। ফণী ডাক্তার তাঁর নাড়ি টিপে খাটের পাশটায় বসে, আর তিনকড়িবাবু এই শীতের মধ্যেও একটা হাতপাখা নিয়ে মাথার পিছনটায় দাঁড়িয়ে হাওয়া করছেন।

ফণীবাবুর নাড়ি দেখা হলে পর রাজেনবাবু যেন বেশ কষ্ট করেই জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে বললেন, 'কাল রাত্রে–বারোটার কিছু পরে ঘুমটা ভাঙতে বিদ্যুতের আলোয় আমার মুখের ঠিক সামনে আই স এ মাস্ক্‌ড্ ফেস্!'

মাস্ক্‌ড্ ফেস্! মুখোস পরা মুখ!

রাজেনবাবু দম নিলেন। ফণী মিত্তির দেখলাম একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখছেন। রাজেনবাবু বললেন, 'দেখে এমন হল যে চিৎকারও বেরোল না গলা দিয়ে। রাতটা যে কীভাবে কেটেছে–তা বলতে পারি না।'

ফেলুদা বলল, 'আপনার জিনিসপত্তর কিছু চুরি যায়নি তো?'

রাজেনবাবু বললেন, 'নাঃ, তবে আমার বিশ্বাস, আমার বালিশের তলা থেকে আমার চাবির গোছাটা নিতেই সে আমার উপর ঝুঁকেছিল। ঘুম ভেঙ্গে যাওয়াতে জানালা দিয়ে লাফিয়ে...ওঃ হরিব্‌ল্, হরিব্‌ল্!'

ফণী ডাক্তার বললেন, 'আপনি উত্তেজিত হবেন না। আপনাকে একটু ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি। আপনার কম্‌প্লিট রেস্টের দরকার।'

ফণীবাবু উঠে পড়লেন। ফেলুদা হঠাৎ বলল, 'ফণীবাবু কাল রাত্রে রুগি দেখতে গেস্‌লেন বুঝি? কোটের পিছনে কাদার ছিটে লাগল কী করে?'

ফণীবাবু তেমন কিছু না ঘাবড়িয়ে বললেন, 'ডাক্তারের লাইফ তো জানেনই–আর্তের সেবায় যখন জীবনটাই উৎসর্গ করিচি, তখন ডাক যখনই আসুক না কেন, বেরোতেই হবে। সে ঝড়ই হোক, আর বৃষ্টিই হোক, আর বরফই পড়ুক।'

ফণীবাবু তাঁর পাওনা টাকা নিয়ে চলে গেলেন। রাজনবাবু এবার সোজা হয়ে উঠে বসে বললেন, 'তোমরা আসাতে অনেকটা সুস্থ বোধ করছি। বেশ খানিকটা ঘাবড়ে গেস্‌লুম, জানো। এবার বোধহয় বৈঠকখানায় গিয়ে একটু বসা চলতে পারে।'

ফেলুদা আর তিনকড়িবাবু হাত ধরাধরি করে রাজেনবাবুকে বৈঠকখানায় এনে বসালেন।
তিনকড়িবাবু বললেন, ‘স্টেশনে ফোন করেছিলুম যদি যাওয়াটা দু দিন পেছোনো যায়। রহস্যের সমাধান না করে যেতে মন চাইছে না। কিন্তু ওরা বললে এ-টিকিট ক্যানসেল করলে দশ দিনের আগে বুকিং পাওয়া যাবে না।’
এটা শুনে আমার ভালই লাগল। আমি চাইছিলাম ফেলুদা একাই ডিটেক্‌টিভের কাজটা করুক। তিনকড়িবাবু যেন ফেলুদার অনেকটা কাজ আগে-আগেই করে দিচ্ছিলেন।
রাজেনবাবু বললেন, ‘আমার চাকরটার পাহারা দেবার কথা ছিল, কিন্তু আমি নিজেই কাল দশটার সময় তাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি। ওর বাড়িতে খুব অসুখ। বুড়ো বাপ আছে, তার এখন-তখন অবস্থা।’
ফেলুদা বলল, ‘মাস্কটা কেমন ছিল মনে আছে?’
রাজেনবাবু বললেন, ‘খুবই সাধারণ নেপালি মুখোশ, দার্জিলিং শহরেই অন্তত আরও তিন-চার শ’ খোঁজ করলে পাওয়া যাবে। আমার এই ঘরেই তো আরও পাঁচখানা রয়েছে–ওই যে, দ্যাখো-না।’
রাজেনবাবু যে মুখোশটার দিকে আঙুল দেখালেন, ঠিক সেই জিনিসটা কাল ফেলুদা আমার জন্য কিনে দিয়েছে।
তিনকড়িবাবু এতক্ষণ বেশি কথা বলেননি, এবার বিওললেন, ‘আমার মনে এবার বোধহয় পুলিশে একটা খবর দেওয়া উচিত। একটা প্রোটেক্‌শনেরও তো দরকার। কাল যা ঘটেছে, তার পরে তো আর ব্যাপারটাকে ঠাট্টা বলে নেওয়া চলে না। ফেলুবাবু, তুমি তোমার নিজের ইচ্ছে মত তদন্ত চালিয়ে যেতে পারো, তাতে তোমায় কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু আমি সব দিক বিবেচনা করে বলছি, এবার পুলিশের সাহায্য নেওয়া দরকার। আমি বরং যাই, গিয়ে একটা ডায়েরি করে আসি। প্রাণের ভয় আছে বলে মনে হয় না, তবে রাজেনবাবু, আপনার ঘণ্টাটা একটু সাবধানে রাখবেন।’
আমরা যখন উঠছি, তখন ফেলুদা রাজেনবাবুকে বলল, ‘তিনকড়িবাবু তো চলে যাচ্ছেন। তার মানে আপনার একটি ঘর খালি হয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি আজ রাতটা ও ঘরে এসে থাকি, তা হলে আপনার কোনও আপত্তি আছে কি?’
রাজেনবাবু বললেন, ‘মোটেই না। আপত্তি কি? তুমি তো হলে আমার প্রায় আত্মীয়ের মতো। আর সত্যি বলতে কী, যতো বুড়ো হচ্ছি তত যেন সাহসটা কমে আসছে। ছেলেবয়সে দুরন্ত হলে নাকি বুড়ো বয়সে মানুষ ম্যাদা মেরে যায়।’
তিনকড়িবাবুকে ফেলুদা বলল স্টেশনে ওঁকে ‘সি-অফ’ করতে যাবে।
ফেরার পথে যখন নেপাল কিউরিও শপের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, তখন আমাদের দুজনেরই চোখ গেল দোকানের ভিতর।
দেখলাম দুজন ভদ্রলোক দোকানের ভিতর জিনিসপত্র দেখছে আর পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। দেখে মনে হয় দুজনের অনেক দিনের আলাপ।
একজন অবনী ঘোষাল, আর একজন প্রবীর মজুমদার।
আমি ফেলুদার দিকে চাইলাম।
তার মুখের ভাব দেখে মনে হল না সে কোনও আশ্চর্য জিনিস দেখেছে।
সাড়ে দশটার সময় স্টেশনে গেলাম তিনকড়িবাবুকে গুড বাই করতে। উনি এলেন আমাদেরও পাঁচ মিনিট পরে।
‘চড়াই উঠে উঠে পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে তাই আস্তে হাঁটতে হল।’ সত্যিই ভদ্রলোক একটু খোঁড়াচ্ছিলেন।
নীল রঙের ফার্স্ট ক্লাস কামরায় উঠে তিনকড়িবাবু তাঁর অ্যাটাচিকেস খুলে একটা ব্রাউন কাগজের প্যাকেট ফেলুদাকে দিলেন।

‘এটা কিনতেও একটু সময় লাগল। রাজেনবাবু তো আর কিউরিওর দোকানে যেতে পারলেন না, অথচ কাল সত্যিই অনেক ভাল জিনিস এসেছে। তার থেকে একটি সামান্য জিনিস বাছাই করে ওঁর জন্য এনেছি। তোমরা আমার নাম করে শুভেচ্ছা জানিয়ে ওঁকে দিয়ে দিও।

ফেলুদা প্যাকেটটা নিয়ে বলল, আপনার ঠিকানা দিয়ে গেলেন না? মিস্ট্রিটা সল্‌ভ করে আপনাকে জানিয়ে দেব ভাবছিলাম যে।’

তিনকড়িবাবু বললেন, ‘আমার প্রকাশকের ঠিকানাটা আমার বইতেই পাবে–তার কেয়ারে লিখলেই চিঠি আমার কাছে পৌঁছে যাবে। গুড লাক!’

ট্রেন ছেড়ে দিল। ফেলুদা আমাকে বলল, ‘লোকটা বিদেশে জন্মালে দারুন নাম আর পয়সা করত। পর পর এতগুলো ভাল রহস্য উপন্যাস খুব কম লোকেই লিখেছে।’

সারা দিন ধরে ফেলুদা রাজেনবাবুর ব্যাপারটা নিয়ে নানান জায়গায় ঘোরাফেরা করল। আমি অনেক করে বলতেও আমাকে সঙ্গে নিল না। সন্ধেবেলা যখন রাজেনবাবুর বাড়ি যাচ্ছি, তখন ফেলুদাকে বললাম, ‘কোথায় কোথায় গেলে সেইটে অন্তত বলবে তো!’

ফেলুদা বলল, ‘দুবার মাউন্ট এভারেস্ট হোটেল, একবার ফণী মিত্তরের বাড়ি, একবার নেপাল কিউরিও শপ, একবার লাইব্রেরি, আর এছাড়াও আরও কয়েকটা জায়গা।’

‘ও।’

‘আর কিছু জানতে চাস?’

‘অপরাধী কে বুঝতে পেরেছ?’

‘এখনও বলার সময় আসেনি।’

‘কাউকে সন্দেহ করেছ?’

‘ভাল ডিটেক্টিভ হলে প্রত্যেককেই সন্দেহ করতে হয়।’

‘প্রত্যেককে মানে?’

‘এই ধর–তুই।’

‘আমি?’

‘যার কাছে এই মুখোশ আছে, সে-ই সন্দেহের পাত্র, সে যে-লোকই হোক।’

‘তা হলে তুমিই বা বাদ যাবে কেন?’

‘বেশি বাজে বকিস্‌নি।’

‘বা রে–তুমি যে রাজেনবাবুকে আগে চিনতে, সে কথা তো গোড়ায় বলোনি। তার মানে সত্য গোপন করেছ। আর আমার মুখোশ তো ইচ্ছে করলে তুমিও ব্যবহার করতে পারো–হাতের কাছেই থাকে।’

‘শাটাপ্‌, শাটাপ্‌!

ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি – ৬ষ্ঠ পর্ব

রাজেনবাবুকে এ বেলা দেখে তবু অনেকটা ভাল লাগল। কেমন আছেন জিজ্ঞেস করতে বললেন, ‘দুপুরের দিকটা বেশ ভাল বোধ করছিলাম। যত সন্ধে হয়ে আসছে ততই যেন কেমন অসোয়াস্তি লাগছে।’

ফেলুদা তিনকড়িবাবুর দেওয়া প্যাকেটটা রাজনবাবুকে দিল। সেটা খুলে তার থেকে একটা চমৎকার বুদ্ধের মাথা বের হল। সেটা দেখে রাজনবাবুর চোখ ছলছল করে এল। ধরা গলায় বললেন, ‘খাশা জিনিস, খাশা জিনিস!’

ফেলুদা বলল, ‘পুলিশ থেকে লোক এসেছিল?’

‘আর বলো না। এসে বত্রিশ রকম জেরা করলে। কদ্দুর কী হদিশ পাবে জানি না, তবে আজ থেকে বাড়িটা ওয়াচ করার জন্য লোক থাকবে, সেই যা নিশ্চিন্তি। সত্যি বলতে কী, তোমরা হয়তো না এলেও চলল।’

ফেলুদা বলল, ‘স্যানাটোরিয়ামে বড্ড গোলমাল। এখানে হয়তো চুপচাপ আপনার কেসটা নিয়ে একটু ভাবতে পারব।’

রাজেনবাবু হেসে বললেন, ‘আর তা ছাড়া আমার চাকরটা খুব ভাল রান্না করে। আজ মুরগির মাংস রাঁধতে বলেছি। স্যানাটোরিয়ামে অমনটি খেতে পাবে না।’

রাজেনবাবু আমাদের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

ফেলুদা সটান খাটের উপর শুয়ে পড়ে একটা সিগারেট ধরিয়া কড়িকাঠের দিকে তাগ করে পর পর পাঁচটা ধোঁয়ার রিং ছাড়ল।

তার পর আধবোজা চোখে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ‘ফণী মিত্তির কাল সত্যিই রুগি দেখতে গিয়েছিলেন। কার্ট রোডে একজন ধনী পাঞ্জাবি ব্যবসায়ির বাড়ি। আমি খোঁজ নিয়েছি। সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটা অবধি ওখানে ছিলেন।’

‘তা হলে ফণী মিত্তির অপরাধী নন?’

ফেলুদা আমার কথার জবাব না দিয়ে বলল, ‘প্রবীর মজুমদার ষোলো বছর ইংলণ্ডে থেকে বাংলা প্রায় ভুলেই গেছেন।’

‘তা হলে ওই চিঠি ওর পক্ষে লেখা সম্ভব নয়?’

‘আর ওর টাকার কোনও অভাবই নেই। তা ছাড়া দার্জিলিং-এ এসেও লেবং-এ ঘোড়দৌড়ের বাজিতে উনি অনেক টাকা করেছেন।’

আমি দম আটকে বসে রইলাম। ফেলুদার আরো কিছু বলার আছে সেটা বুঝতে পারছিলাম।

আধখাওয়া সিগারেটটা ক্যারমের ঘুঁটি মারার মতো করে প্রায় দশ হাত দূরের জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে ফেলুদা বলল, ‘আজ চা বাগানের গিলমোর সাহেব দার্জিলিং-এ এসেছে। প্লান্টারস ক্লাবে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। লামার প্রাসাদের আসল ঘণ্টা একটাই আছে, আর সেটা গিলমারের কাছে। রাজনবাবুরটা নকল। অবনী ঘোষাল সেটা জানে।’

‘তা হলে রাজেনবাবুর ঘণ্টা তেমন মূল্যবান নয়?’

‘না।...আর অবনী ঘোষাল কাল রাত্রে একটা পার্টিতে প্রবীর মজুমদারের সঙ্গে রাত ন’টা থেকে ভোর তিনটে অবধি মাতলামি করেছে।’

‘ও। আর মুখোশ পরা লোকটা এসেছিল বারোটার কিছু পরেই।’

'হ্যাঁ।'

আমার বুকের ভেতরটা কেমন খালি খালি লাগছিল। বললাম, 'তা হলে?'

ফেলুদা কিছু না বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে খাট থেকে উঠে পড়ল। ওর ভুরু দুটো যে এতটা কুঁচকোতে পারে, তা আমার জানাই ছিল না।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কী যেন ভেবে ফেলুদা বৈঠকখানার দিকে চলে গেল। যাবার সময় বলল, 'একটু একা থাকতে চাই। ডিস্‌টার্ব করিস না।'

কী আর করি। এবার ওর জায়গায় আমি বিছানায় শুলাম।

সন্ধে হয়ে আসছে। ঘরের বাতিটা আর জ্বালতে ইচ্ছে করল না। খোলা জানলা দিয়ে অবজারভেটরি হিলের দিকটায় অন্যান্য বাড়ির আলো দেখতে পাচ্ছিলাম। বিকেলে ম্যাল থেকে একটা গোলমালের শব্দ পাওয়া যায়। এখন সেটা মিলিয়ে আসছে। একটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেলাম। দূর থেকে কাছ এসে আবার মিলিয়ে গেল।

সময় চলে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে শহরের আলো কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। বোধহয় কুয়াশা হচ্ছে। ঘরের ভিতরটা এখন আরও অন্ধকার। একটা ঘুম-ঘুম ভাব আসছে মনে হল।

চোখের পাতা দুটো কাছাকাছি এসে গেছে, এমন সময় মনে হল, কে যেন ঘরে ঢুকছে।

মনে হতেই এমন ভয় হল যে, যে দিক থেকে লোকটা আসছে, সে দিকে না তাকিয়ে আমি জোর করে নিশ্বাস বন্ধ করে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিন্তু লোকটা যে আমার দিকেই আসছে আর আমার সামনেই এসে দাঁড়াল যে!

জানালার বাইরে শহরের দৃশ্যটা ঢেকে দিয়ে একটা অন্ধকার কী যেন এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে।

তার পর সেই অন্ধকার জিনিসটা নিচু হয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। এইবার তার মুখটা আমার মুখের সামনে, আর সেই মুখে একটা–মুখোশ!

আমি যেই চিৎকার করতে যাব অমনি অন্ধকার শরীরটার একটা হাত উঠে গিয়ে মুখোশটা খুলতেই দেখি–ফেলুদা!

'কী রে–ঘুমিয়ে পড়েছিলি নাই?'

'ওঃ–ফেলুদা–তুমি?'

'তা আমি না তো কে? তুই কি ভেবেছিলি...?'

ফেলুদা ব্যাপারটা বুঝে একটা অট্টহাসি করতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গম্ভীর হয়ে গেল। তার পর খাটের পাশটায় বসে বলল, 'রাজেনবাবুর মুখোশগুলো সব কটা পরে দেখছিলাম। তুই এইটে একবার পর তো।'

ফেলুদা আমাকে মুখোশটা পরিয়ে দিল।

'অস্বাভাবিক কিছু লাগছে কি?'

'কই না তো। আমার পক্ষে একটু বড়, এই যা।'

'আর কিচ্ছু না?' ভাল করে ভেবে দেখ তো।'

'একটু...একটু যেন...গন্ধ।'

'কীসের গন্ধ?'

'চুরুট।'

ফেলুদা মুখোশটা খুলে নিয়ে বলল, 'এগজ্যাক্টলি।'

আমার বুকের ভিতরটা আবার টিপ টিপ করছিল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তি-তিনকড়িবাবু?'

ফেলুদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সুযোগের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি ছিল এঁরই। বাংলা উপন্যাস, খবরের কাগজ, ব্লেড, আঠা কোনওটারই অভাব নেই। আর তুই লক্ষ করেছিলি নিশ্চয়ই–স্টেশনে আজ যেন একটু খোঁড়াচ্ছিলেন। সেটা বোধহয় কাল জানালার বাহিরে লাফিয়ে পড়ার দরুন। কিন্তু আসল যেটা রহস্য, সেটা হল–কারণটা কী? রাজেনবাবুকে তো মনে হয় রীতিমতো সমীহ করতেন ভদ্রলোক। তা হলে কী কারণে, কী উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই চিঠি লিখেছিলেন? এটার উত্তর বোধ হয় আর জানা যাবে না...কোনও দিনও না।'

ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি – ৭ম পর্ব (শেষ)

রাজেনবাবুকে এ বেলা দেখে তবু অনেকটা ভাল লাগল। কেমন আছেন জিজ্ঞেস করতে বললেন, ‘দুপুরের দিকটা বেশ ভাল বোধ করছিলাম। যত সন্ধে হয়ে আসছে ততই যেন কেমন অসোয়াস্তি লাগছে।’

ফেলুদা তিনকড়িবাবুর দেওয়া প্যাকেটটা রাজনবাবুকে দিল। সেটা খুলে তার থেকে একটা চমৎকার বুদ্ধের মাথা বের হল। সেটা দেখে রাজনবাবুর চোখ ছলছল করে এল। ধরা গলায় বললেন, ‘খাশা জিনিস, খাশা জিনিস!’

ফেলুদা বলল, ‘পুলিশ থেকে লোক এসেছিল?’

‘আর বলো না। এসে বত্রিশ রকম জেরা করলে। কদ্দুর কী হদিশ পাবে জানি না, তবে আজ থেকে বাড়িটা ওয়াচ করার জন্য লোক থাকবে, সেই যা নিশ্চিন্তি। সত্যি বলতে কী, তোমরা হয়তো না এলেও চলল।’

ফেলুদা বলল, ‘স্যানাটোরিয়ামে বড্ড গোলমাল। এখানে হয়তো চুপচাপ আপনার কেসটা নিয়ে একটু ভাবতে পারব।’

রাজেনবাবু হেসে বললেন, ‘আর তা ছাড়া আমার চাকরটা খুব ভাল রান্না করে। আজ মুরগির মাংস রাঁধতে বলেছি। স্যানাটোরিয়ামে অমনটি খেতে পাবে না।’

রাজেনবাবু আমাদের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

ফেলুদা সটান খাটের উপর শুয়ে পড়ে একটা সিগারেট ধরিয়া কড়িকাঠের দিকে তাগ করে পর পর পাঁচটা ধোঁয়ার রিং ছাড়ল।

তার পর আধবোজা চোখে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ‘ফণী মিত্তির কাল সত্যিই রুগি দেখতে গিয়েছিলেন। কার্ট রোডে একজন ধনী পাঞ্জাবি ব্যবসায়ির বাড়ি। আমি খোঁজ নিয়েছি। সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটা অবধি ওখানে ছিলেন।’

‘তা হলে ফণী মিত্তির অপরাধী নন?’

ফেলুদা আমার কথার জবাব না দিয়ে বলল, ‘প্রবীর মজুমদার ষোলো বছর ইংলণ্ডে থেকে বাংলা প্রায় ভুলেই গেছেন।’

‘তা হলে ওই চিঠি ওর পক্ষে লেখা সম্ভব নয়?’

‘আর ওর টাকার কোনও অভাবই নেই। তা ছাড়া দার্জিলিং-এ এসেও লেবং-এ ঘোড়দৌড়ের বাজিতে উনি অনেক টাকা করেছেন।’

আমি দম আটকে বসে রইলাম। ফেলুদার আরো কিছু বলার আছে সেটা বুঝতে পারছিলাম।

আধখাওয়া সিগারেটটা ক্যারমের ঘুঁটি মারার মতো করে প্রায় দশ হাত দূরের জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে ফেলুদা বলল, ‘আজ চা বাগানের গিলমোর সাহেব দার্জিলিং-এ এসেছে। প্লান্টারস ক্লাবে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। লামার প্রাসাদের আসল ঘণ্টা একটাই আছে, আর সেটা গিলমারের কাছে। রাজনবাবুরটা নকল। অবনী ঘোষাল সেটা জানে।’

‘তা হলে রাজেনবাবুর ঘণ্টা তেমন মূল্যবান নয়?’

'না।...আর অবনী ঘোষাল কাল রাত্রে একটা পার্টিতে প্রবীর মজুমদারের সঙ্গে রাত ন'টা থেকে ভোর তিনটে অবধি মাতলামি করেছে।'

'ও। আর মুখোশ পরা লোকটা এসেছিল বারোটার কিছু পরেই।'

'হ্যাঁ।'

আমার বুকের ভেতরটা কেমন খালি খালি লাগছিল। বললাম, 'তা হলে?'

ফেলুদা কিছু না বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে খাট থেকে উঠে পড়ল। ওর ভুরু দুটো যে এতটা কুঁচকোতে পারে, তা আমার জানাই ছিল না।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কী যেন ভেবে ফেলুদা বৈঠকখানার দিকে চলে গেল। যাবার সময় বলল, 'একটু একা থাকতে চাই। ডিস্‌টার্ব করিস না।'

কী আর করি। এবার ওর জায়গায় আমি বিছানায় শুলাম।

সন্ধে হয়ে আসছে। ঘরের বাতিটা আর জ্বালতে ইচ্ছে করল না। খোলা জানলা দিয়ে অবজারভেটরি হিলের দিকটায় অন্যান্য বাড়ির আলো দেখতে পাচ্ছিলাম। বিকেলে ম্যাল থেকে একটা গোলমালের শব্দ পাওয়া যায়। এখন সেটা মিলিয়ে আসছে। একটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেলাম। দূর থেকে কাছ এসে আবার মিলিয়ে গেল।

সময় চলে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে শহরের আলো কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। বোধহয় কুয়াশা হচ্ছে। ঘরের ভিতরটা এখন আরও অন্ধকার। একটা ঘুম-ঘুম ভাব আসছে মনে হল।

চোখের পাতা দুটো কাছাকাছি এসে গেছে, এমন সময় মনে হল, কে যেন ঘরে ঢুকছে। মনে হতেই এমন ভয় হল যে, যে দিক থেকে লোকটা আসছে, সে দিকে না তাকিয়ে আমি জোর করে নিশ্বাস বন্ধ করে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিন্তু লোকটা যে আমার দিকেই আসছে আর আমার সামনেই এসে দাঁড়াল যে! জানালার বাইরে শহরের দৃশ্যটা ঢেকে দিয়ে একটা অন্ধকার কী যেন এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে।

তার পর সেই অন্ধকার জিনিসটা নিচু হয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। এইবার তার মুখটা আমার মুখের সামনে, আর সেই মুখে একটা–মুখোশ!

আমি যেই চিৎকার করতে যাব অমনি অন্ধকার শরীরটার একটা হাত উঠে গিয়ে মুখোশটা খুলতেই দেখি–ফেলুদা!

'কী রে–ঘুমিয়ে পড়েছিলি নাই?'

'ওঃ–ফেলুদা–তুমি?'

'তা আমি না তো কে? তুই কি ভেবেছিলি...?'

ফেলুদা ব্যাপারটা বুঝে একটা অট্টহাসি করতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গম্ভীর হয়ে গেল। তার পর খাটের পাশটায় বসে বলল, 'রাজেনবাবুর মুখোশগুলো সব কটা পরে দেখছিলাম। তুই এইটে একবার পর তো।'

ফেলুদা আমাকে মুখোশটা পরিয়ে দিল।

'অস্বাভাবিক কিছু লাগছে কি?'

'কই না তো। আমার পক্ষে একটু বড়, এই যা।'

'আর কিচ্ছু না?' ভাল করে ভেবে দেখ তো।'

'একটু...একটু যেন...গন্ধ।'

'কীসের গন্ধ?'

'চুরুট।'

ফেলুদা মুখোশটা খুলে নিয়ে বলল, 'এগজ্যাক্টলি।'

আমার বুকের ভিতরটা আবার টিপ টিপ করছিল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তি-তিনকড়িবাবু?'

ফেলুদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সুযোগের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি ছিল এঁরই। বাংলা উপন্যাস, খবরের কাগজ, ব্লেড, আঠা কোনওটারই অভাব নেই। আর তুই লক্ষ করেছিলি নিশ্চয়ই–স্টেশনে আজ যেন একটু খোঁড়াচ্ছিলেন। সেটা বোধহয় কাল জানালার বাহিরে লাফিয়ে পড়ার দরুন। কিন্তু আসল যেটা রহস্য, সেটা হল–কারণটা কী? রাজেনবাবুকে তো মনে হয় রীতিমতো সমীহ করতেন ভদ্রলোক। তা হলে কী কারণে, কী উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই চিঠি লিখেছিলেন? এটার উত্তর বোধ হয় আর জানা যাবে না...কোনও দিনও না।'